নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

ইমদাদ ইসলাম

নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা একটি ন্যায্য ও সমতাপূর্ণ সমাজের পূর্বশর্ত। কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্য, কটূক্তি, ও যৌন হয়রানির মতো আচরণ তাদের সম্মান ও সম্ভাবনার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ নারীর দক্ষতা, সৃজনশীলতা, এবং পেশাগত উন্নতির জন্য অপরিহার্য।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন নারী 'আওয়াজ তুলি, একতাবদ্ধ হই' শিরোনামে একটি পোস্ট করেছেন। পোস্টটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজকের আধুনিক সভ্যতা পর্যন্ত নারীদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করতে হয়েছে নারীর নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী এবং দৃঢ় করার জন্য। নারীকে নিরন্তর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে তার আত্মপ্রকাশের সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়েছে। নারীরা এগিয়েছে। তাদের কাজের ক্ষেত্র বেড়েছে। কর্মজীবী নারীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি, রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নারীরা তাদের পদচিহ্ন রেখেছে সফলতার সাথে। এমনকি এই ভূখণ্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সকল আন্দোলনে রাজপথে নারীদের সাহসী এবং ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছে কখনো স্কুল কলেজের ছাত্রী, কখনো শিক্ষিকা, কখনো পেশাজীবী, কখনো গৃহিণী বা কখনো মা, এরকম বিভিন্ন পরিচয়ে।

বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানুষ তার মেধা ও মননেও হচ্ছে আধুনিক। কিন্তু নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতার ঠিক কতটুকু পরিবর্তন আমরা আনতে পেরেছি? নারীকে ভাবা হয় দুর্বল। নারীকে ধরে নেয়া হয় পুরুষের মালিকানাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ। একটি অদৃশ্য গ্লাস সিলিংয়ের ঘেরাটোপে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খান নারীরা। এমনকি নির্যাতনের শিকার কোনো নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যদি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসেন তখন সকলে সেই আক্রান্ত নারীর চারিত্রিক দুর্বলতা খুঁজতে থাকেন। এর কারণ আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক পরিমণ্ডলে নারীকে পুরুষের চেয়ে কম যোগ্য বা পুরুষের অধস্তন ও দুর্বল ভাবা।

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের যে নতুন প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেই বাংলাদেশে নারীর প্রতি কোনো প্রকার কোনো বৈষম্য মেনে নেয়া যাবে না। এভাবে বসতে নেই, ওভাবে চলতে নেই, এটা বলতে নেই, ওটা করতে নেই, লোকে কী বলবে- এইসব বাক্যবাণ কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে স্বকীয়তা নিয়ে। সমাজে নারীকে দুর্বল 'মেয়ে মানুষ' নয় বরং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে গণ্য করার সংস্কৃতি নিশ্চিত করতে হবে। কতিপয় পুরুষের মনোজগতে পরিবর্তন আনতে না পারলে নারীর নিগ্রহের ঘটনা ঘটতেই থাকবে, নির্যাতন কমবে না। এই পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হয়ে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে নারীদেরকেই। নারীরা একতাবদ্ধ হতে না পারলে পুরুষ সমাজ নারীকে অবমাননা করবে। প্রতি পদক্ষেপে নারীকে হোঁচট খেতে হবে।

দাপ্তরিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে, কাজের বাস্তবায়নের ধরনে বা বিভিন্ন ইস্যুতে নারীদের মধ্যে নানাবিধ মতবিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি কোনো পুরুষ সহকর্মীর কটূক্তি, অসম্মান, অসংলগ্ন আচরণ, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলা, নারীর প্রতি এমন যেকোনো কথা বা আচার আচরণ যা তার আত্মসম্মানে আঘাত হানে এই সকল কিছুর বিরুদ্ধে আমরা নারী সহকর্মীবৃন্দ এক এবং অভিন্ন। একজনের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ সকল নারী সহকর্মীর সাথে একই ধরনের আচরণের সমতুল্য। এক্ষেত্রে সিনিয়র জুনিয়র সকল নারীর ভূমিকাও হওয়া উচিত অভিন্ন। একজন নারী যদি কোথাও আক্রমণের শিকার হয় তাহলে দশ জনকে এগিয়ে আসতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। নারীর কোনো ধরনের অধিকার আদায়ের বিষয়, মর্যাদা সংশ্লিষ্ট বিষয়, অসম্মানের বিষয় সামনে আসলে সকল নারীকে একতাবদ্ধ হয়ে শক্ত হাতে তা মোকাবেলা করতে হবে। সহকর্মীর পাশাপাশি আমরা নারীরা যেন হই সহযোদ্ধা, সেই দীক্ষা নিয়ে পথ চলতে হবে। কোনো কাপুরুষের যেন সাহস না হয় নারীর প্রতি সামান্যতম বাজে আচরণ করার, ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলার।

আমাদের সংবিধানে শুধু নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও, নারীরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। নারীরা আজ সুন্দর ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। সব ধরনের জড়তা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সত্তা ও একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এ দেশের নারীরা শিক্ষা, চাকরি ,নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায় থেকে দেশ জাতির উন্নতি, অগ্রগতিতে কাজ করছে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তবে নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিছু বাধা ও প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে।সমাজ বা রাষ্ট্র এখনো পুরোপুরি সেসব সমস্যার সমাধান করতে পরেনি। আমাদের দেশে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ কম-বেশি আড়াই কেটি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও জেন্ডার-সম্পর্কিত সামাজিক প্রথাগুলোর ভিত্তিতে নারীদের জন্য কিছু গ্রহণযোগ্য পেশা রয়েছে। তৈরি পোশাক শ্রমিক ছাড়া নার্স, বিউটি পারলার কর্মী, গৃহকর্মী, গৃহভিত্তিক দরজি ও গৃহভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মতো হাতেগোনা কিছু পেশাকেই মূলত শহরের নারীরা বেছে নেন,তবে উচ্চ শিক্ষিত নারীদের কথা ভিন্ন । এসব পেশার অধিকাংশই খণ্ডকালীন ও অনিয়মিত প্রকৃতির, যেখানে কাজের চাহিদা যেমন কম, কাজ হারানোর ঝুঁকিও তেমন বেশি। বাংলাদেশে জিডিপিতে পুরুষ এবং নারীর অবদান প্রায় সমান। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে না পারলে নারীর

ক্ষমতায়ন, সুশাসন এমনকি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই নারীর জন্য সঠিক কর্মপরিবেশ তৈরিতে যেসব বাধা বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে দূর করার প্রয়াস নেয়া দরকার।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ (সিডও) সনদের ১১ অনুচ্ছেদে কর্মসংস্থানের অধিকার, পেশা বা চাকুরি বেছে নেয়ার অধিকার, পদোন্নতি, চাকুরির নিরাপত্তাসহ বৈষম্যহীনভাবে সকল সুবিধা ভোগের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ সনদে স্বীকৃত অধিকার সমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের লক্ষ্যে অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ সত্ত্বেও নারীর প্রতি বৈষম্য ,নানা কৌশলে সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে যৌন হয়রানিমূলক সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের দিকনির্দেশনা চেয়ে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের প্রেক্ষিতে ১৪মে, ২০০৯ মহামান্য হাইকোর্ট দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করেন। এ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: ক) যৌন হয়রানি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা; খ) যৌন হয়রানির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং গ) যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ এবং পালন করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নীতিমালার ৩ ও ৪ ধারায় নির্ধারিত নির্দেশনাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৩ ধারা অনুযায়ী, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগদাতাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের আওতায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ৪ ধারায় যৌন হয়রানির সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হয়েছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শ, অশালীন ভাষা বা মন্তব্য, পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন, ব্ল্যাকমেইল, এবং ভীতি প্রদর্শনসহ যেকোনো যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। এসব আচরণ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীকে তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। নীতিমালার এই নির্দেশনাগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুরক্ষিত ও সম্মানজনক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

এ নীতিমালার ১১ ধারায় শাস্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাত্র ব্যতিরেকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করতে পারেন এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে, অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাদেরকে শ্রেণিকক্ষে আসা থেকে বিরত রাখতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে এবং সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা বিধি অনুসারে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যদি উক্ত অভিযোগ দণ্ডবিধির যেকোনো ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে পণ্য হয় তাহলে প্রয়োজনীয় ফৌজদারি আইনের আশ্রয় নিতে হবে যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচার হবে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ করতে হবে।

নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করা এবং আইনগত ও সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নারী যেন তার স্বাধীনতার পথ খুঁজে পায়। নারী উন্নয়নের মৌলিক বাধাগুলো দূর হয়ে যাক, আর দূর হোক অধিকারহীনতা, সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার অন্ধকার। নারীর এগিয়ে চলার পথ আরও দ্রুততর হোক। আসুন, নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই এবং দৃঢ়ভাবে আওয়াজ তুলি।

#

পিআইডি ফিচার